দ্রবময়ীর কাশীবাস

(গল্পগ্রন্থ – নবাগত)

দু'দিন থেকে জিনিসপত্র গুছনো চলল। পাড়ার মধ্যে আছে মাত্র তিনঘর প্রতিবেশী—কারোসঙ্গে কারো কথাবার্তা নেই। পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল, পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরনো আম-কাঁঠালের বাগান। দ্রব ঠাকরুণের বাড়ির চারিধার বনে বনে নিবিড়, সূর্যেরআলো কস্মিন্‌কালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ির সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর, দিনরাত 'ষাঁওকো' 'ষাঁওকো' ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনেরাতে মশার বিন্‌বিনুনি।

দ্রব ঠাকরুণের নাতি বল্লে—ঠাক্‌মা, সাবু আছে ঘরে, না বাজার থেকে আনব?

দ্রব ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ শোনাল, কারণ আজ দু'মাসকাল তিনি ম্যালেরিয়ায়ভুগছেন—পালাজ্বর, ঘড়ির কাঁটার নিয়মে তা আসবে একদিন অন্তর অন্তর ঠিক বিকেলবেলাটিতে। দ্রব ঠাকরুণ পুরোনো কাঁথা-লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়বেন, উঃ-আঃকরবেন—জ্বরের ধমকে ভুল বকবেন।

ও বাড়ির ন'ঠাকরুণ এসে জিজ্ঞেস করবেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে—বলি ও দিদি, অমন করচ কেন? জ্বর এল নাকি?

—আর ন-বউ! মলেই বাঁচি! নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর—ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানোটা কামড়াচ্চে!...একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না—এ কি কাণ্ড, হ্যাঁগা?

পরে মিনতির সুরে বলবেন—ও ন-বউ, নক্ষী দিদি, শীত তো আজ ভাঙল না, কাঁথা গায়ে দিইচি, নেপ গায়ে দিইচি—তুমি ওই বাঁশের আর পুরনো তোশকটা পেড়ে আমার গায়ে যদি দিয়ে দ্যাও—

—চেপে ধরব, হ্যাঁ দিদি?

—ধ-রো—ন-বউ-চেপে ধ-রো—আমার হ-য়ে গেল!

—ভয় কি, অমন ক'রো না, ছিঃ! টেবু আসবে চিঠি পেলেই, কানু আসবে, বিন্দেআসবে—তোমার নাতিরা বেঁচে থাক্‌, অমন সোনার চাঁদ নাতি সব, ভাবনা কি তোমার দিদি?

—কে-উ—আ-মা-কে—দে-খে-না—ন-বউ—

—কেন দেখবে না দিদি—সবাই দেখবে। তুমি বেশি বোকো না, চুপটি করে শুয়েথাকো—

—আমার গো-রু! গো-রু উ-ও-র-মা-ঠে—

—কোথায় গোরু দিয়ে এসেছিলে?

—জ-টে গ-য়-লা-র অ-ড়-ল ক্ষে-তে-র পাশে—

—আচ্ছা আমি এনে দেব এখন গোরু। আমারও গোরু রয়েচে জটে গোয়ালার জমিরকাছেই। তুমি শুয়ে থাকো।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে বৃদ্ধা ন'ঠাকরুণ আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বল্লেন— কম্প থেমেচে দিদি?

ক্ষীণস্বরে লেপ-কাঁথার ছেড়া স্তূপের মধ্যে থেকে জবাব এল—গোরু! আমার গোরুতো—

—কোনো ভয় নেই। সে আমি এনেচি। কম্প থেমেছে?

—হুঁ।

সারা বর্ষা দ্রবময়ী এমনি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। তার বড় নাতি শ্রীশচন্দ্র ওরফে টেবু কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়, মেজ নাতি পাক্‌শীতে ই.বি.আর-এ—ছোট নাতিওওদিকে যেন কোথায় থাকে। বড় নাতি ছাড়া অন্য দুটি অবিবাহিত, বড় নাতির আবার একটিছেলে হয়েচে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে বড় নাতি ছেলে-বউ নিয়ে বাড়ি এসে দিনসাতেকছিল। নাতবউ মনোরমা হুগলী জেলার মেয়ে, সে এখানে এসে নাকসিঁটকে থাকে, 'বাড়ি তোভারি, মোটে একখানা চালাঘর, ছেঁচার বেড়া, এমনিধারা জঙ্গল যে দিনমানেই বুনো শূওরলুকিয়ে থাকে—মশার তো ঝাঁক! মাগো, কি কাদা ঘাটের পথে! এখেনে কি মানুষ থাকে নাকি?'মনোরমার

খাঁড়ার মতো নাক আরো উঁচু ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দ্রবময়ীকে নাতিরছেলে খোকন্‌মণির মায়া কাটাতে হয়। তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ন'ঠাকরুণকে বলেন—সুদের সুদ, ও যে কি মিষ্টি তা তোমাকে কি বোঝাব ন-বউ—

দ্রবময়ীর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে যে কতকালের পিপাসিত প্রতীক্ষা সুদূরভবিষ্যতের দিকেনিষ্পলকে চেয়ে আছে, স্বামীহীনা বন্ধ্যা বিধবা ন'ঠাকরুণ তা বুঝতে না পেরে কেমন অবাকহয়ে যান, হয়তো বা ভাবেন—দিদির সবই বাড়াবাড়ি!

ন'ঠাকরুণ আপনারজন কেউ নয়—পাড়ার পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী মাত্র। বছরের মধ্যেগড়ে তিন-চার মাস দুই বৃদ্ধার মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ-দেখাদেখি থাকে না—তবুওঝগড়া কেটে গেলে পাড়ার মধ্যে একমাত্র ন'ঠাকরুণই দ্রবময়ীকে দেখাশুনা করেন সব চেয়ে বেশি, জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে তার গোরুটাও নিজের গোরু দুটোর সঙ্গে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসেন, একটু সাবু হয়তো করে নিয়ে আসেন, অন্তত জানালায় উঁকি মেরে দু'একটা কথাও বলেন।

কিন্তু এবার দ্রবময়ী যেন ভুগছেন একটু বেশি।

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে জ্বর শুরু হয়েছে, মাঝে মাঝে প্রায়ই ভোগেন।

শরীর দুর্বল হয়ে পড়েচে—ঘোর অরুচি তার ওপর। পালাজ্বরে ধরেচে আজ মাসখানেক।

সন্ধ্যার দিকে দ্রবময়ী লেপ-তোশক ফেলে ঝেড়ে উঠলেন। পালাজ্বরের কম্প থেমে গিয়েচে। জ্বর যদিও এখনো যায়নি—মুখ তেতো, মাথা ভার, শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করচে।

ডাক দিলেন—ও ন-বউ, গোরু এনেচ দিদি?

দু'তিনবার ডাকের পর ন'ঠাকরুণ উত্তর দিলেন—কে ডাকে, দিদি? ঠেলে উঠেচ?

—বলি আমার গোরুডো কি এনেচ মাঠ থেকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই ম'লে শেষকালডা! জ্বর ছেড়েচে?

—ছেড়েচে—ছেড়েচে। বলি গোরু কোথায় বেঁধে রাখলে?

—গোয়ালে গো গোয়ালে—ক্ষেপলে যে গোরু গোরু করে—

কেরোসিন তেল একটা টেমিতে একটুখানি ছিল, দ্রব ঠাকরুণ টেমিটা জ্বালালেন। আমড়া গাছে একটা তেড়ো পাখি আর একটা তেড়ো পাখির সঙ্গে কথাবার্তা কইচে, দ্রব ঠাকুরণেরজরতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হল পাখি দুটো বলচে:

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কি একঘেয়ে আওয়াজ রে বাপু! চালাচ্চে তো চালাচ্চেই, আধঘণ্টা হয়ে গেল—একে মাথা ধরে আছে, ভাল লাগে? থাম্‌ না বাপু! মানুষে জানোয়ারে সবাই মিলে পেছনে লাগলে কি করে বাঁচি—

গোহালে গিয়ে দ্রব ঠাকরুণ মুংলি গোরুকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করলেন। মুংলি না খেলেতার খাওয়া হয় না, এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন, সবাইছেড়ে গিয়েচে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তার দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি, নাতনী—একঘর, বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকত আজ বজায়!

কেউ নেই আজ। মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথপুরের ভিটেতে। তাইগোরুটাকে অত ভালবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বারবার করে দেখে আসেন, নদীতে জলখাওয়াতে নিয়ে যান।

সকালে উঠে দ্রব ঠাকরুণের মনে হল খিদের চোটে তিনি দাঁড়াতে পারছেন না। বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ থেকে ডুমর পেড়ে আনলেন, দুটো সজনে শাকপাড়লেন উঠোনের গাছ থেকে। ঘাটের পথে মুখুজ্জে গিন্নির সঙ্গে দেখা। মুখুজ্জে গিন্নির ছেলেক'টি লেখাপড়া শেখেনি, গাঁজা খেয়ে বেড়ায়—দ্রব ঠাকরুণের ক'টি নাতি চাকুরে, এজন্যে দ্রবঠাকরুণের প্রতি তার অন্তরে অন্তরে হিংসে বেশ।

জিজ্ঞেস করলেন—জ্বর হয়েছিল নাকি শুনলাম খুড়িমার?

—হ্যাঁ মা, আজ দুটো ভাত রাঁধব। তাই সকাল সকাল ঘাটে যাচ্চি—

—আর মা, তোমার থাকতেও নেই—অমনসব নাতি-নাতনী থাকতেও তোমার এইদুর্দশা—সবই কপাল!

অর্থাৎ দুই চাকুরে নাতি আছে বলে তোমার গুমর করবার কিছু নেই। তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে দুধারে শুধু বন আর বাগান। কোনো বাগানে বেড়া দেওয়া নেই, ঘন আশশেওড়া ও বনচালতে গাছের ডালপালা স্নানার্থীদের গায়ে লাগে বলে দু'একজন শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা পথের নিতান্ত পাশের ডালগুলো হাত দিয়ে ভেঙে রেখেছেন। দ্রব ঠাকরুণবনের মধ্যে ঢুকে উঁকি মেরে কি দেখছেন, এমন সময় মুখুজ্জেদের সেজ বউ পেছন থেকে বললে—কি দেখছেন, ও খুড়িমা?

—এই খয়েরখাগী কাঁঠালগাছটাতে কাঁঠাল আছে কিনা এক-আধটা মা—একটা গাছকাঁঠাল, সব্বনেশেদের জন্যে যদি মা তার কিছু ঘরে উঠল—নিজে থাকি অসুখে পড়ে—

—কে কাঁঠাল নিলে খুড়িমা?

—কে নিয়েচে আমি কি চৌকি দিতে গিয়েচি বসে বসে? এই পাড়ার মধ্যেই চোরেরঝাড়-দ্যাখ তোর, না দ্যাখ মোর! সব্বনেশে কলিকালে কি ধম্মেজ্ঞান আছে মা?

—চলুন খুড়িমা, ঘাটে যাই—

দ্রব ঠাকরুণ বকতে বকতে ঘাটের দিকে চলেন। স্নান সেরে এসে দুটো আলোচাল ফুটিয়ে ডুমুরের চচ্চড়ি করে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন বাড়িরপেছনে কাগজীলেবু গাছটার তলায় কি খস্‌খস্ শব্দ হচ্চে।

দ্রব ঠাকরুণ হাঁক দিলেন—কে রে নেবুতলায়?

ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে উত্তর এল—এই আমি কনক, ঠাকুমা—

—কেন, ওখানে কি শুনি? কি হচ্চে ওখানে? বের হয়ে আয় ইদিকে, সামনে আয়!

একটি ম্যালেরিয়াশীর্ণ দশ-এগারো বছরের বালিকামূর্তি অকুণ্ঠ পদবিক্ষেপে লেবু-ঝোপেরআড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে দ্রব ঠাকরুণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ালো।

—এই আমার মার মুখে অরুচি—কিছু খেতে পারে না, তাই গিয়ে বললে—যা তোরঠাকুরমার নেবুগাছ থেকে একটা নেবু—

দ্রব ঠাকরুণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—হ্যাঁ যা—তোর বাবা নেবু গাছ পুঁতেরেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোরছ্যাঁচড় নিয়ে হয়েচে—তোর মার অরুচি, তা হাটে নেবু কিনতে পারিসনে? এখানে কি? তোর বাবার গাছ আছে এখানে?

বালিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্রব ঠাকরুণ আপনমনে বকে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বালিকা ভয়ে ভয়েবল্লেও ঠাকুরমা—

—কি রে? কি?

—আমি চলে যাব?

—কেন, তোকে কি বেঁধে রেখেচি নাকি? যা—

নেবু দেবেন না?

দ্রব ঠাকরুণ চুপ করে আপনমনে বড় বড় কয়েকটি ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিলেন, বাঁহাতে ঘটি নিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত নরমসুরে জিজ্ঞেস করলেন তোর পরনের কাপড় কাচা? ওই কলসিটা থেকে আমায় একটু খাবার জল গড়িয়ে দে দেখি—

মেয়েটি তাই করলে। দ্রব ঠাকরুণ বললেন—অরুচি কেন ? তোর মার কি ছেলেপিলেহবে নাকি?

—তা তো জানিনে ঠাক্‌মা।

—যা, নিয়ে যা—তবে একটার বেশি নিবিনে—বুঝলি?

দ্রব ঠাকরুণ খেয়ে উঠে মাদুর পেতে একটু শুয়েছেন, এমন সময় মুখুজ্জে বাড়ির বড় ছেলে অতুল এসে বল্লেও ঠাক্‌মা, শুয়েচেন নাকি?

—হ্যাঁ, কে? অতুল? কি ভাই?

—আপনার পিটুলি গাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেছেগাঁয়ের পিটুলি আর শিমুল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে—বেশ দর দিচ্চে—

—না বাপু, আমার নেই।

—কেন, আপনার বাড়ির পেছনে হরি রায়ের দরুণ জঙ্গলে তো বেশ বড় বড় পিটুলিগাছ আচে—

—না, আমি বেচব না।

আসলে দ্রব ঠাকরুণের গাছপালার ওপর বড় মায়া, স্বামীর আমলের যা কিছু যৎসামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জঙ্গলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে ভর্তি। জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রি করলেও এ কয়লার দুর্মূল্যতার দিনে দু'পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটতেওতার মায়া। না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রির কথা তুলতেও দেবেন না। একজনেরশুঁয়োপোকা লাগাতে সে ডুমুরপাতা পাড়তে এসেছিল, কারণডুমুরপাতা দিয়ে শুঁয়ো-লাগা জায়গাটা ঘষলে শুঁয়ো ঝরে যায়, কিন্তু দ্রব ঠাকরুণ তাকে ডুমুরপাতা পাড়তে দেননি। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত গল্প মাত্র, তবে এর দ্বারা তার মনের অবস্থা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈকালের দিকে দ্রব ঠাকরুণ বেশ ভালই বোধ করলেন। পাড়ার এক প্রান্তে জঙ্গলে ঘেরাবাড়ি, বড় কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, এক ন'ঠাকরুণ ছাড়া কেউ উঁকি মেরে বড় একটাদেখে না, দ্রব ঠাকরুণ কিন্তু লোকজন, আড্ডা মজলিস প্রভৃতি ভালই বাসেন। কেউ এসে গল্পকরে, এটা তার খুবই ইচ্ছে—কিন্তু ও-বেলার সেই বালিকাটি ছাড়া বিকেলে আর কেউ এল না।সেও এসেচে নিজের স্বার্থে।

–ঠাকুরমা, একটা নেবু দেবেন?

—কেন রে, কেন? ওবেলা তো—

—ওবেলার নেবু ওবেলা ফুরিয়েচে, এবেলা একটা দরকার—মা বল্লে—

–আচ্ছা, আয় উঠে, বোসএকটু—

বালিকাটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে বসে। নয়তো নেবু পাওয়া যায় না। বুড়ির কাছে বসতে তার ইচ্ছে হয় না, তার সমবয়সী বালিকারা রায়পাড়ার পুকুরধারে এতক্ষণ ফুল তোলাতুলিখেলা আরম্ভ করে দিয়েছে—তার প্রাণ রয়েছে সেখানে পড়ে। কিন্তু দ্রব ঠাকরুণের নিঃসঙ্গ মন যাকে হয় আঁকড়ে ধরতে চায় এই নির্জন বৈকাল বেলাটিতে—তবুও দুটো কথা বলবার লোকতো বটে।

দ্রব ঠাকরুণ আপনমনেই বকে চলেছেন, নাতবউয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাকে কি রকম ভালবাসে...এই ধরনের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে— ঠাক্‌মা, মা সাবু চড়িয়ে আমায় বল্লে, নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল—

—হ্যাঁ হচ্চে হচ্চে —তারপর শোন না...

—মা বক্‌বে—নেবু নইলে সাবু খেতে পারবে না—

—আচ্ছা, শোন্—তারপর খোকনমণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়েনা —ওর মাও দেবে না—বড় হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বউ, চাচ্চে খেতে, একটুকরো ওকে দ্যাও—তা আমায় বললে—আপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার—একালের মাও অন্য রকম, আপনাদের সেকাল গিয়েচে।...আমিজানিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে—তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগেরবেটী?

—আমি এবার যাই ঠাক্‌মা—নেবু একটা—

—আচ্ছা তা যা নিয়ে একটা নেবু—শুনলি তো সব কাণ্ডখানা ! দিদিশাশুড়ি বড় মন্দ—

এমন সময়ে বাড়ির বাইরে একখানা গোরুরগাড়ির শব্দ শোনা গেল। খুকি কৌতূহলেচোখ বড় বড় করে বল্লেও ঠাক্‌মা, কে যেন এল গাড়ি করে—তোমার ওই তুঁততলায় গাড়ি দাঁড়াল—

বলতে বলতে দ্রব ঠাকরুণের মেজ নাতি নীরদচন্দ্র দুটি ভারী মোট দু'হাতে ঝুলিয়ে বাড়িঢুকে ডাক দিলে—ও ঠাক্‌মা—

দ্রব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বল্লেন—কানু? আয়, আয় ভাই—ভালআছিস?

কানু এসে মোট নামিয়ে পিতামহীকে প্রণাম করলে, বালিকাটির দিকে চেয়ে বল্লে—এহরিকাকার মেয়ে কনক না? ওঃ কত বড় হয়ে গিয়েছে—ভাল আছিস কনকী? নে দাঁড়াএকখানা গজা নিয়ে যা—

পুঁটলি খুলে মেয়েটির হাতে একখানা বড় গজা দিতে সে নিঃশব্দে হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বড় মোটটার মধ্যে আরো কি কি জিনিস আছে দেখবার আগ্রহে। তাদের বাড়িতে এমন কেউ নেই যে বিদেশে চাকুরি করে—নিতান্তই অল্পবিত্ত গৃহস্থেরসংসার—চাকুরে বাবুরা বাড়ি আসবার সময় কি কি অপূর্ব জিনিস না জানি নিয়ে আসে!

দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর, কি মনে করে? হঠাৎ যে! বুড়িকে মনে পড়েছেতা হলে? বাবাঃ, সারা আষাঢ় মাস অসুখে ভুগে ভুগে—তাই এখনো কি সেরেচি! এমন একটালোক নেই যে, এক ঘটি জল এগিয়ে দ্যায়—ওই ন-বউ ছিল তাই—এত চিঠি দিলাম, না এলটেবু, না এল বিন্দে, না এলে তুমি—

সন্ধ্যার পর ন'ঠাকরুণ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। গ্রামের ছেলে, জন্মাতে দেখেছেন, অনেকদিন পরে দেখে খুব খুশি। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার পর বল্লেন—হ্যাঁকানু, তা তোমরাসোনার চাঁদ সব নাতি থাকতে বুড়ি এখানে বেঘোরে মারা যাবে! পালাজ্বরে ধরেচে—এই আজভাল আছে, কাল এমন সময় লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়বে! কে দ্যাখে, কে শোনে—তার ওপরআবার গোরু—একটা বিহিত করে যাও যা হয়—নইলে—

কানু বল্লে—সেসবের জন্যেই তো আসা। চিঠি পেয়েছি অনেক দিন, সায়েব ছুটি দিতেচায় না—পরের চাকরি—তাই দেরি হল।

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—ভাল কথা, ও ন-বউ, দুখানা গজা নিয়ে যাও, জল খেয়ো—কানুএনেচে আমার জন্যে—তা ও যেমন পাগল, আমার কি দাঁত আছে যে গজা খাব? নিয়ে যাওন-বউ।

—তা দ্যাও দু'খানা, নিয়ে যাই। ভালটা মন্দটা এ পাড়াগাঁয়ে তো চক্ষেই দেখতে পাইনে দিদি—বেঁচে থাক্ তোমার সোনার চাঁদ নাতিরা, তোমার ভাবনাটা কিসের? বিশেষ করে কানুরমতো ছেলে নেই এ গাঁয়ে—আমি যা বলব তা মুখের ওপরেই বলব বাপু—ফলে ন-বউ দু'খানার জায়গায় চারখানা গজা হাতে খুশি মনে বাড়ির দিকে চল্লেন আরকিছুক্ষণ পরে।

নাতি-ঠাকুরমার পরামর্শ হ'ল রাত্রে। কানু এক মতলব ফেঁদে এসেচে। ঠাকুরমাকে সে কাশী নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। তার একজন কে বন্ধুর মা কাশীতে থাকেন, সেই একইবাড়িতে ঠাকুরমাকে রাখবে। পরদিন সকালে ন-বউ শুনে খুব খুশি, অমন সব নাতি থাকতে ভাবনা কি? তীর্থধর্ম করার সময়ই তো এই। তার যদি আজ ছেলেটাও বেঁচে থাকত!

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে সাত মাস মাত্র বয়সে ন'ঠাকরুণের ছেলে মারা গিয়েছে—সে-ই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর আর ছেলেপুলে হয়নি।

যাবার দিন দ্রব ঠাকরুণ প্রিয় মুংলি গোরুটার ভার দিয়ে গেলেন ন-বউকে। বার বার মাথায় দিব্য দিলেন, মুংলিকে যেন যত্ন করা হয়। বল্লেন—ও গোরু তোমারই হয়ে গেল ন-বউ, আমার আশীর্বাদ করো যেন কাশীতে হাড় ক'খানা রাখতে পারি—নাতিদের ঘাড়ের বোঝা যেননেমে যাই—আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার সচ্ছল অবস্থা, লুচি-পরোটা জলখাবার, তেলঘিয়ে কলকলে করে পাঁচ ব্যান্নুন রান্না—আমি বুড়ি হয়েছি, ওদের সংসারে সেকেলে মতেরলোকের জায়গা আর হয় না এখন—

ঘরের আড়ায় শুকনো নারকোল পাতার আঁটি, পাকাটির বোঝা যোগাড় করা ছিল, বর্ষায়উনুন ধরানোর কষ্ট বলে সুগৃহিণী দ্রব ঠাকরুণ 'যে-সময়ের-যা' সঞ্চয় করে রাখতেন। কাশীবাসকরতে যাচ্ছেন, পেছনটান থাকলে তীর্থবাস হয় না—সে সব দান করে গেলেন কতকন'ঠাকরুণকে, কতক একে ওকে।

কনক একটা পাকা শসা হাতে এসে বল্লে—শসা খাবে ঠাক্মা?

—তুই এক বোঝা পাকাটি নিয়ে যা কনকী—ঠাক্মাকে মনে রাখবি তো, হ্যাঁ-রে?

কনক অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বল্লে—হুঁ-উ-উ—

ন'ঠাকরুণ চোখের জল ফেললেন যাবার সময়ে।

দ্রব ঠাকরুণ ট্রেনে কোনো রকমে শুচিতা বজায় রেখে কাশী এসে পৌঁছলেন। একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ির নিচের তলার ঘরে কানুর সেই বন্ধুর মা কাশীবাস করছেন। পাশেই আর একখানা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে দ্রব ঠাকরুণের জন্যে। অপর বৃদ্ধাটির কাছে চাবি ছিল ঘরের, তিনি চাবি খুলে দিলেন। দ্রব ঠাকরুণ নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেইঘরে অধিষ্ঠান হলেন।

দ্রব ঠাকরুণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলেন, তার প্রতিবেশিনী নদেজেলার লোক। কথাবার্তার ধরন ও সুর শহুরে ও সম্পূর্ণ মার্জিত। যশোর জেলার মানুষ দ্রবঠাকরুণের ভয় পাবারই কথা বটে। তিনি এসে দ্রব ঠাকরুণের ঘরে ঢুকে বল্লেন আপনাররান্নাবান্নার ব্যবস্থা কাল থেকে করলেই হবে—আজ আমার ঘরে দুধ আর মিষ্টি আছে, আপনারজন্যে রাখলুম কিনা।

দ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে বল্লেন—ও!

প্রতিবেশিনী নিজের ঘর থেকে খাবার এনে বল্লেন—আপনার লোমবস্ত্র বার করুন—দ্রব ঠাকরুণ ভাল বুঝতে না পেরে বল্লেন—কি বল্লেন ?

দ্রব ঠাকরুণের 'বল্লেন'এই কথায় 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার উচ্চারণ রীতিঅনুযায়ী প্রসারিত উচ্চারণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এই সব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভবআকুঞ্চিত। 'বল্লেন'-এর উচ্চারণ 'বোল্লেন'–'ও' কার-এর উচ্চারণও যতদূর সম্ভব ঘোরাল।

—বোলচি, লোমবস্ত্র বের করে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো?

লোমবস্ত্র কি জিনিস, পাড়াগাঁয়ের মানুষ দ্রব ঠাকরুণ কখনো শোনেননি—তবে জিনিসটা যে বস্তুজাতীয় দ্রব্য তা বুঝতে পারলেন, বল্লেন—সে তো আমার নেই।

—লোমবস্ত্র নেই? আপনি জপ করেন কি পরে?

—এই সাদা থান পরেই জপ করি, আর কোথায় কি পাব?

বাড়িখানা গলির মুখে হ'লেও প্রায় সদর রাস্তার ওপরে। অনেক রাত পর্যন্ত গাড়িঘোড়া রাস্তার গোলমাল থামে না। নিরিবিলি বনজঙ্গলের মধ্যে বাড়িতে একা থাকা দ্রব ঠাকরুণেরচিরদিনের অভ্যাস, এত গোলমালে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। উঃ, কি মুস্কিলেইপড়া গেল! নাঃ, কাশীর লোক ঘুমোয় কখন?

কানু তার পরদিন বন্ধুর হাতে পল্লীবাসিনী পিতামহীকে সমর্পণ করে কর্মস্থানে চলে গেল, তার ছুটি ফুরিয়েছে। বন্ধুর মার নাম নীরজবাসিনী, দ্রব ঠাকরুণের চেয়ে তার বয়স দু'পাঁচ বছরকম হবে, মাথার সব চুল এখনো পাকেনি—তবে সেটা স্বাস্থ্যের গুণেও হতে পারে।

দ্রব ঠাকরুণ এঁর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বেড়াতে গেলেন—খুব লোকজনের ভিড়, গান, বক্তৃতা, কথকতা। এক গেরুয়া কাপড় পরা সন্নিসির চারিপাশে খুব ভিড়, নীরজাসেখানে জুটলেন গিয়ে। কর্মবাদ, সেবাধর্ম ইত্যাদি নিয়ে সন্নিসি কি সব কথা বলে যাচ্ছেন, দ্রবঠাকরুণ অতশত বুঝতে পারলেন না। ফিরবার পথে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—উনিকেডা?

—উনি রামকৃষ্ণ মঠের একজন বড় ইয়ে—স্বামী সেবানন্দ।

—কি মঠ?

—কেন, রামকৃষ্ণ মঠের কথা শোনেননি? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের—মস্ত বড় কাণ্ডওঁদের—

—রাম আর কৃষ্ণ দুই ঠাকুরের নাম বুঝি ?

নীরজা বিস্ময়ে দ্রব ঠাকরুণের দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শোনেননি?

—না। কে তিনি—কই না—এখানে আছেন?

নীরজা আর কোনো কথা বল্লেন না। এমন বর্বরের সঙ্গেও তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম পর্যন্ত জানে না! দ্রব ঠাকরুণের কোনো দোষ নেই, তিনি অজ্ঞ সেকেলে লোক, অজ পল্লীগ্রাম ছেড়ে জীবনে কখনো কোথাও যাননি। গোপীনাথপুরের জঙ্গলে ও-নামকখনো কারো মুখে শোনেনওনি। তিনি জানেন, রাম, কৃষ্ণ রাধা, দুর্গা, লোচনপুরের জাগ্রতকালী, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি। অতবড় নামের কোনো ঠাকুরের কথা—কই কেউ তো তাকেবলেনি।

দ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মূর্খ বলে নাঠাওরান।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই দ্রব ঠাকরুণ বুঝে নিলেন সঙ্গিনীটি ধর্মবাতিকগ্রস্তা।সাধুসন্নিসির ভক্ত। যদি কোথাও কোনো নতুন ধরনের সাধু মন্দিরে কি ঘাটে বসে আছে, তবেআর নিস্তার নেই। সেখানে বসে অমনি গরুড়ের মতো হাত জোড় করে বক্‌বক্ বকুনি জুড়েদেবে। আর কি-সব কথা জিজ্ঞেস করবে, কর্মফল কি, পুনর্জন্ম কি, হেনো তেনো। রাস্তাঘাটে বেরুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বাসায় ফেরবার নামটি নেই। এত বিরক্ত ধরে দ্রব ঠাকরুণের—কিন্তু তিনি কি করবেন? কাশীর রাস্তা চেনেন না—একাও বাসায় ফিরতে পারেন নাসঙ্গিনী না ফিরলে।

একদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে গেলেন দুজনেই।

সেখানে এক সন্ন্যাসিনী নাটমন্দিরে বসে আছেন, গেরুয়া কাপড় পরনে, মাথায় জটা, অনেক মেয়েছেলের ভিড় হয়েছে সেখানে। নীরজা তো সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে সর্বদা একপায়ে খাড়া, চারিপাশের

ভক্তের দলে গেল মিশে তাঁকে নিয়ে। দ্রব ঠাকরুণ শুনতে লাগলেন কেউ জিজ্ঞেস করচে, মাইজি, ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায় ?

কেউ বলচে—মাইজি, আমার মেয়ের মাদুলি দেবেন তো আজ?

—আজ আমার হাতখানা দয়া করে দেখবেন কি?

নীরজা জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি, আমার ভক্তি হচ্ছে না কেন?

দ্রব ঠাকরুণ শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচেন না। সর্বদা সাধুসন্নিসি নিয়েই আছো, এখানে প্রণাম, ওখানে ধন্না, দুঘণ্টা ধরে নাক টেপা—এতেও যদি তোমার ভক্তি না হয়ে থাকে, গঙ্গার জলে ডুবে মরো গিয়ে—ঢং দেখে আর বাঁচিনে! মরণ আর কি!

তারপরই সবাই চলে গেল—নীরজা সেই যে সেখানে চোখ বুজে ধ্যান না কি যোগে বসল, আর ওঠে না! দ্রব ঠাকরুণও কিছু বলতে সাহস পান না। এদিকে তার মনে পড়ল সুজিএকদম নেই, সেকথা এতক্ষণ মনে ছিল না, এত রাত হয়ে গেল, কোথায় বা সুজি কেনা হবে!রাত্রে একটু মোহনভোগ খাওয়া, তাও আজ ধর্মের ভিড়ে বুঝি বা হয় না!

বসে বসে দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে বাঙালি মেয়েরা প্রায় সব চলে গিয়েছে, এদেশী লোক যারা হিন্দিমিন্দি বলে, তাদের দলই যাচ্চে আসচে। কি জানি ওদেরকথা তিনি কিছুই বুঝতেও পারেন না, বলতেও পারেন না!

আজ মাস তিনেক গ্রাম থেকে এসেচেন। বেশ শীত পড়ে গিয়েচে কাশীতে। মুংলিগোরুটার কথা এত করেও আজকাল মনে পড়চে! শীতের রাত্রে পাছে মুংলির কষ্ট হয় বলেতিনি গোয়ালে আগুন করে রাখতেন। তাঁর গাছটাতে খুব ডুমুর হয়েছে নিশ্চয়, কে জানে একটা গাছ ডুমুর কারা খাচ্চে? কম ডুমুর হয় গাছটাতে! আহা, ন-বউ কি মুংলিকে অত যত্নকরচে?—তার মতো? তিনি যে পেটের মেয়ের মতো ওকে...না, তার চোখে জল এসে পড়ে।

আজই এতকাল পরে ন-বউয়ের পত্র এসেছে দেশ থেকে...তাই বেশি করে মনে পড়ছে দেশের কথা। ন-বউ লিখেচে মুংলি ভাল আছে, শীগ্‌গির বাছুর হবে। তার বাড়ির দাওয়ার খুঁটি নাবদলালে নয়। কানু বা বিন্দেকে যেন চিঠি লেখা হয় সেজন্যে।

নীরজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দিদি, চলো যাই... সত্যি কি পবিত্র স্থান, না? ইচ্ছে হয় না যে আবার সংসারে ফিরে যাই, রাঁধি খাই!

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—মরো না এখানে শুকিয়ে হত্যে দিয়ে—কে মাথার দিব্যিদিয়েছে রাঁধতে খেতে!

নীরজা বল্লেন—করন্যাসটা অভ্যেস করছি কিনা, প্রায় হয়ে এল—

দ্রবময়ী নীরব। মাগীটা পাগল নকি? কি সব বলে বোঝাও যায় না! রাত দুপুর বাজল, বাবা, এখন বাসায় চল্ দিকি!

বাসায় এসেও কি তাই নিস্তার আছে?

নীরজা ডাকবেন তার ঘর থেকে—ও দিদি, একটু গীতাপাঠ করি শোনো—

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাকে যেতে হয়। গীতা-টিতা ওসব তিনি বোঝেন না। সুবচনীরব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা এসব শোনা তার অভ্যেস আছে, বেশদিব্যি বুঝতেও পারেন—এসব শক্ত শক্ত কথার কি কাণ্ডমাণ্ড, এক বর্ণও যদি তিনি বোঝেন! আর মাগীর চোখ উল্টে, কান্না কান্না মুখের ভাব করে পড়বার ভঙ্গিই বা কি! দ্রব ঠাকরুণ না পারেন হাসতে, না পারেন হাসি চাপতে! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা!

নীরজা পড়তে পড়তে বললেন—আহা-হা! কি চমৎকার!

দ্রব ঠাকরুণ বসে ঢুলতে ঢুলতে ভাববেন—থামলে যে বাঁচি—

সকালে উঠে নীরজা বল্লেন—আজ আমার গুরুদেব আসবেন, দিদি দু'খানা লুচি ভেজেদিয়ো তো আমার ঘরে বসে।

বেলা দুটোর সময় এক সন্নিসি এসে হাজির। বেশ মোটা ভুড়িওয়ালা, এই লম্বা দাড়ি। নীরজা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে দু'বার মাথা ঠুকলেন গুরুদেবের পাদপদ্মে। আহারাদির যোগাড়করতেই কাটল সারাদিন—তিনসের দুধ মেরে একসের হ'ল, ঘরে রাবড়ি মালাই তৈরি হ'ল।লুচি ভাজা হল। সন্ধ্যার সময় নীরজা বসলেন গুরুর কাছে কি সব ক্রিয়া শিখতে। আসন নামাথামুণ্ড তাই শিখতে। যত বা এ বকে, তত বা ও বকে। মনে হ'ল বুঝি কানের পোকা সববেরিয়ে যায়!

গুরুদেব বাঙালি। রাত ন'টার পরে দ্রব ঠাকরুণকে ডাক দিলেন।

বল্লেন—তোমার বাড়ি কোথায় ?

—গোপীনাথপুর, যশোর জেলা—

—কে আছে বাড়িতে?

—নাতিরা আছে, তাদের ছেলে-বউ আছে।

—তুমি কাশীবাস করতে এসেচ ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

—দ্রবময়ী দেব্যা—

—দীক্ষা হয়েচে?

—না।

নীরজা চোখ কপালে তুলে বলেন—কি সর্বনাশ! দীক্ষা হয়নি এতদিন? তা তো জানতাম না?

গুরুদেব বল্লেন—দীক্ষা নিতে হবে মা তোমাকে।

—আমার পয়সা নেই, দীক্ষা নিতে গেলে খরচ আছে। নাতিরা এগারো টাকা করে মাসে পাঠায়—তার মধ্যে ঘরভাড়া, তার মধ্যে খাওয়া। পয়সা পাই কোথায় ?

—দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি মা?

—ফলের জন্যে তো আসিনি, শরীরডা সারাতি এসেছিলাম।

নীরজা রাগের সুরে বল্লেন—শরীর আগে না পরকাল আগে?

দ্রব ঠাকরুণ চুপ করে রইলেন।

গুরুদেব বল্লেন—নীরজা-মার কথার উত্তর দাও—চুপ করে থাকলে হবে না।

নীরজা বল্লেন—গীতার ভক্তিযোগ সেদিন পড়ছিলাম, শুনলে তো দিদি? কর্মের চেয়েওভক্তি বড়, স্বয়ং ভগবান বলছেন—

আঃ, কি বিপদ! মাগীর সব সময়েই কি আবোল-তাবোল বকুনি?

মুখে বল্লেন—আমি তো কিছু বুঝিনে, আপনারা যা বলেন। তবে এবার কিছু হবে না। নাতি সাতটাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘরভাড়াতেই গিয়েছে। হাতে টাকা না থাকলি—

তবুও দু'জনই নাছোড়বান্দা। দীক্ষা নিতেই হবে।

গুরুদেব বল্লেন—কাশীবাস করচো মা, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। গুরুদীক্ষা নানিলে যে সবই মাটি। আজ আছ, কাল নেই! পৃথিবী কিছুই না—ইহকাল কিছুই না—

নীরজা বল্লেন—গুরুর মুখেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহকালেও তিনি, পরকালেওতিনি—

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—আ মরণ মাগীর! তবে সোয়ামী কোথায় যাবেমেয়েদের! ঢং দ্যাখো না! যাই হোক, বহু তর্ক করেও ঠাকরুণকে দ্রব করা গেল না। নামদ্রবময়ী হলে কি হবে, ভেতরে বেজায় শক্ত। নীরজা অবিশ্যি তার জ্ঞান বুদ্ধি মতে একজনসত্তর বছরের মৃত্যুপথযাত্রিণীর ভাল করবারই যথেষ্ট চেষ্টা করছিলেন, সে রাজী না হলে তিনিআর কি করবেন?

নীরজার ভক্তি—হ্যাঁ, সে দেখবার মতো একটা জিনিস বটে। গুরুর পাদোদক পান নাকরে তিনি দাঁতে তৃণ কাটবেন না। গুরুর বাক্য বেদবাক্যের চেয়েও মূল্যবান তার কাছে।পুরোনো একছড়া সোনার হার ছিল, সেটা বিক্রি করে এসে টাকা তুলে দিলেন গুরুদেবেরহাতে।

কথাটা শুনে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে গুরুদেবকে?

—টাকা সার্থক হল, দিদি—

—তোমার নিজের হার?

—ও আমার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়েছিল—তিনি হাতে করে দিয়েছিলেন—

—সেই হার তুমি দিয়ে দিলে বেচে?

—দিদি, সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সবই ভগবানেরমায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা—গুরুই কেবল নিত্য বস্তু—

—তা তো বটে।

এ মাগীর মুখে সব সময় বড় বড় কথা। দিগে যা তোর সব কিছু গুরুর পাদপদ্মে বিলিয়ে,—তাঁর কি? বিয়ের পরে স্বামী নিজের হাতে যে হারছড়া দিয়েছিল, তা কোনোমেয়েমানুষ এভাবে ঘুচিয়ে দিতে পারে? গভীর রাত পর্যন্ত শুধু এই কথাটিই বার বার তার মনেপড়ে। সে সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা। ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত—

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের প্রথমে উত্তর দিকের ভাঙা পাঁচিলের গায়েএতটুকুএকটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েছে দেখে তিনি শুকনো কঞ্চি কুড়িয়েএকটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে গাছ বড় হয়েছে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে!কে খাচ্চে সে বনের মধ্যে? হয়তো কনকী আসে লেবু তুলতে—এক গাছ লেবু রেখেএসেছিলেন, সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে?

হঠাৎ কি একটা কুস্বরে দ্রব ঠাকরুণ চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসছে। মাগী এত রাত্রে করে কি? হুস্ হুস্ করে অত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে কেন? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগল নাকি?

দ্রব ঠাকরুণ ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বল্লেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা,ঠাকুর তাইবলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও দ্যায় না রাত্তিরে!

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—যাক গে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয়নি তো?

—না দিদি-ঘুমুইনি এখনো। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েইকাটাব, তবে পরকালের কাজ করব কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চিনে, পাবোও না। দেহ কিজন্যে দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়, আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু দিন কিনে নাও—

দ্রব ঠাকরুণের পিত্তি জ্বলে গেল। কিনগে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে! রাত্তিরেএকটু ঘুমুতে দে অন্তত!

শীতকাল এসে গেল। কানু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সঙ্গে দেখাকরে গেল।

দ্রব ঠাকরুণ তাকে বল্লেন—কানু ভাই, অন্য একটা বাসা পাওয়া যায় না?

কানু বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন, এখানে কি হ'ল? সত্যর মা রয়েচেন, এই তো সবচেয়ে ভাল—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল! সে কি!

—না বাবু, বেজায় ধর্মিষ্টি। অত ধর্মিষ্টি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়েযা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড!

বল্লে—আচ্ছা ঠাক্‌মা, শেষবয়সে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্মিষ্টি! হ্যাঁ, উনি ওই রকমই বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের—ওঁকে কত চিঠিপত্তর, কতঅনুরোধ—কিছুতেই গেলেন না! বল্লেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়েপড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্যন্ত করলে, কোনো ফল হ'ল না।

দ্রব ঠাকরুণ অবাক হয়ে বল্লেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাক্‌মা?

—আমায় এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই!

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাক্‌মা? ওঁর সঙ্গে থেকে একটু ধর্ম শেখো না, চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে!

—হাঁফ লেগে মরে যাব যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মতো কথাবার্তা—ঠাক্‌মা তুমি কি!

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলেও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবর নেইঅনেকদিন। ন'ঠাকরুণের চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ। কথায় কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেল্লেন।

—দেশে কে আছে আপনার? শুনেছি সেখানে থাকে না কেউ?

—বাড়িটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনো ওই সবের মায়া? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুন, সব বন্ধনঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলেওপরের দিকে চেয়ে রইলেন।

দ্রব ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়াও, কড়ার দুধটুকুবুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল! নাঃ, বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল, তত বা বাঁদর! অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন, কেদার ঘাটে কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক।শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভাল না, আজ থাক, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন দ্রব ঠাকরুণকে। কেদার ঘাটে এর আগেওদু'তিন বার দ্রব গিয়েচেন সত্যর মা'র সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সারোগামতো কথক ঠাকুর কথকতা শুরু করেছেন—তাকে ঘিরে বাঙালি মেয়ে-পুরুষের ভিড়।পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞেস করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বল্লে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং দ্যাও। নাতিরা ক'টাকা বা পাঠায় ?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালের তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদার ঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড় একটা বজরা ভেসে চলেচে, দু-তিনখানা পান্সিতে সুসজ্জিত নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েছে। রামনগরের দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ির ছাদের কার্নিসে তরল সোনার মতো ঝিলমিল করচে রাঙারোদ। কথক ঠাকুর সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকারঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে—এই হল গানের অর্থ।

দ্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞানে অনেকদূরে চলে গেল। তার খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠালহয়েছে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আম গাছে আমও নিশচয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েছে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই!বারোভূতে লুটে খাচ্ছে!

রাত্রি নামল। নীরজা বল্লে—চলুন দিদি—

দ্রব ঠাকরুণ লক্ষ করেছেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী ফোঁস ফোঁস করে কেঁদেছে। আরকেবল বলেছে—আহা-হা-হা!

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন!—কিন্তু তা হবার নয়, কানু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তার সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্ক ভাব, বিশেষকোনো কথা বলে না।

কাশীখণ্ড শুনে আজ তা হলে খুব ভাল লেগেচে বোধ হয়! পাষাণ বুঝি গলেছে!নীরজা বল্লেন—কি ভাবছেন দিদি?

—একটা গাছ কাঁঠাল দেশে। খয়েরখাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনো খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনো আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দু'টো একটা গাছ, আমার তিনটে বড় বাগান-কলমের বোম্বাই, 'মালদ' ফজলি—মায় ন্যাংড়া পর্যন্ত। আমি তো ফিরেওচাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েছে তোমার? আমি বলি, না, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কেবা কার পর, কে কার আপন? (এই মরেছে, মাগী আবার শুরু করেচে!) কালশয্যা পরে মোহতা

ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন—তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপন অনেকদেখলুম। এইবার পরকালের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারীমুক্তপুরুষ—ওঁর কৃপায়—(নীরজা উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)।

দ্রব ঠাকরুণ মুখে বল্লেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি, কাল বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরেসেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়েযাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধনমুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক'দিন দিদি! শমন তো দোরেদাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম—

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরন শোনোনা, ভাটপাড়ার ভট্চাজ্জি এসেচেন! মুখে বল্লেন—মুংলি বলে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড় ন্যাওটো। যেখানে যাব, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেটভরতো না। এই বেশ কচি কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি—আর—

—আঃ, আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী-পূর্বজন্মের এক হরিণের মায়ায় তার সব গেল। ভগবানের চিন্তা করুন—ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুণ কোনো কথা বল্লেন না। তার ওর কথা একেবারেই ভাল লাগে না। মাগী যেন কি! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ি গেল না! মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন তার গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচতলায় ম্লানমুখে ছলছলে চোখে তার মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েচে—নবউ তাকে যত্ন করছে না, বুড়ি হয়েছে মুংলি, তেমন দুধ তো আর দিতে পারে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বার করে এতকাল নিজের মেয়ের মতো পুষেছিলেন—তিনি নেই, কে ওকে দেখে! কাঁঠাল হয়েছে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্ছেননদীতে, মুখুজ্জে-গিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়িমা, এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায়একটা দিয়ো, তোমার নাতিদের খেতে দেব—

খড় উড়ে উড়ে পড়ছে বাড়ির চাল থেকে! কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সারায়নি!এবার বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে ?

কনক বলচে—অ ঠাক্মা, একটা নেবু দেবা? আমার মার অরুচি হয়েছে, কিছু খেতি পারেনা—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান করে এসে স্বপাকে হবিষান্ন চড়িয়েছেন এবংপ্রতিদিনের অভ্যাসমতো ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গাল-বাদ্যসহকারে শিবপূজা করচেন। দ্রব ঠাকরুণের একটু বেলা হয়েছে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তার আপনার জন পড়ে রইল—তার মুংলি, তার খয়েরখাগী গাছটা, তার ডুমুর গাছ—আর তিনি কোথায়! আরো ওইমাগীর জ্বালায়...

নীরজার গাল-বাদ্য থামল। দ্রব ঠাকরুণকে বল্লেন—আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মতো কাশীবাস করচেবাঙালিটোলায় থাকে, বল্লে, গুরুদেব আসচেন সামনের সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরার পথেআমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তবে যাবেন। সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে কিনা। আজবড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আচি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়ব না। গুরুদীক্ষা না হলে দেহ পবিত্র হয় না, ভবসাগর পার হতে হলে গুরুর চরণরূপ-ভেলা চাই আগে—নইলে হাবুডুবুখেয়ে মরতে হবে যে দিদি!

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্বেই শনিবার সকালের গাড়িতে কানু এসে হাজির হ'ল। দ্রব ঠাকরুণ নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায় গোপীনাথপুরে নিয়ে চল্ ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন, ও মাগীর কাছে আর দু'মাস থাকলে আমিপাগল হয়ে যাব।

ফলে সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিনদুপুরের ট্রেনে দ্রব ঠাকরুণ দেশেরইস্টিশানে তার বোঁচকা-তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

ন'ঠাকরুণ শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি-দিদি—

—হ্যাঁ ন-বউ—আমার মুংলি ভাল আছে?

—ভাল নেই দিদি। ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই, গোয়ালে শুয়েইথাকে।

—সে আমার মন বলেচে ভাই, তুমি কি বলবে? তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল্ ভাই গোপীনাথপুর, মাথায় থাকুনবাবা বিশ্বনাথ—মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওয়াব নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন'ঠাকরুণ দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চেহারা নেই।সব কাজ ফেলে দ্রব ঠাকরুণ ছুটে গিয়ে তার গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তারও চোখে জল পড়ে।

ন'ঠাকরুণ বল্লেন—আর-জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর-জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন'বৌ—তুমিও বড় বড় কথা বলতে শুরু করলে নাকি সেই মাগীর মত! মুংলি এ জন্মেই আমার মেয়ে—আর-জন্ম-টন্ম ছেড়ে দাও!

—কে মাগী, কার কথা বলচো—

—সে বলব এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কানু হেসে বল্লে—নাঃ, ঠাক্মাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক— কাশীপ্রাপ্তিঅদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বল, ন-বউ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তাদের কোলে শুয়েসকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়—আমাকেওতোরা ওখানে—

আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুণ চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায়-যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেছে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ।দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ, এই বাড়ির উঠোনে পা দিয়েছিলেন, এখন তার বয়েস তিন কুড়ি হয়। কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েবল্লে—ঠাক্মা, ভাল আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতি অ্যালাম—আমাদের কথা মনেছিল?